গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা | ২ - ৮ অক্টোবর ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শাসকদলের পূর্ণ মদতেই জ্ঞানেশ কুমার কাজ করেছেন

এত দিন ধরে নির্বাচন কমিশনের সাথে বিজেপি-র আঁতাতের যে অভিযোগ সাধারণ মানুষ করছিলেন, তা একেবারে খোলাখুলি সামনে চলে এল ২৩ সেপ্টেম্বর। 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর প্রতিবেদনে দুই সাংবাদিকের অন্তর্তদন্তে দেখা গেছে, এসআইআর নামক বিশাল কাণ্ডটি যে নির্বাচন কমিশনের নামে সম্পন্ন হয়েছে, তা বাস্তবে চলেছে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির কলের পুতুল হিসাবে কাজ করা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে। এমনকি তাঁর সমান পদমর্যাদার অন্য দুই কমিশনারও থেকেছেন পুরো অন্ধকারে। এই কায়দাতেই দেশের ১৩ কোটি মানুষের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও আইনি পরিসরকে অস্বীকার করে যথেচ্ছাচার চালিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতাদের বিশেষ আস্থাভাজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। নির্বাচন কমিশনের আইন অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তিন কমিশনারের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই মান্যতা দেওয়া বিধি। অথচ এ ক্ষেত্রে দেখা গেছে দিনের পর দিন কোনও বৈঠক হয়নি। বৈঠকের কোনও লিখিত সিদ্ধান্ত নেই। ভারতের নির্বাচন কমিশনের বহু নির্দেশিকা অপর দুই কমিশনার সংবাদমাধ্যম থেকে বা অন্য সূত্র থেকে জেনেছেন। অর্থাৎ স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে যে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকা দরকার, তার কিছুই ছিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ ও অবিলম্বে এসআইআর বাতিলের দাবি

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আজ 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ এসআইআর সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ, বিশেষত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সততা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এই তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনজন নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে দু'জন এসআইআর-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের আপত্তি নথিভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ক্ষমতাসীন দল বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এবং বিভিন্ন রাজ্যে তাদের নির্বাচনী বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একতরফা ভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এটি নিঃসন্দেহে একটি ফ্যাসিবাদী আক্রমণ।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি— মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে

চারের পাতায় দেখুন

জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত ও এসআইআর বাতিলের দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর এসপ্ল্যানেডে এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ মিছিল। পোড়ানো হয় জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল। সংবাদ চারের পাতায়

নারী সুরক্ষা ও নির্যাতন বন্ধের দাবিতে সোচ্চার

এআইএমএসএস রাজ্য সম্মেলন

আগামী দিনের আন্দোলন আরও শাণিত করার অঙ্গীকার নিয়ে ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর কোচবিহার শহরে সম্পন্ন হল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের অষ্টম রাজ্য সম্মেলন। নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর পূর্ণ নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা, এসআইআর-এর নামে নাগরিক হয়রানি বন্ধ করে এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে ২৬ সেপ্টেম্বর হাজার হাজার মহিলার মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে কোচবিহারের রাজপথ। ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল রাসমেলা মাঠে পৌঁছলে সেখানে আয়োজিত প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড মাধবী প্রামাণিক।

আটের পাতায় দেখুন

কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে বিশাল মহিলা সমাবেশের একাংশ। ২৬ সেপ্টেম্বর

দেশের খনিজ সম্পদ ধনকুবেরদের হাতে তুলে দিতে চাইছে সরকার

দেশের সম্পদ— খাল-বিল-নদী-নালা, বন-জঙ্গল, জমি, খনিজ সম্পদ— সমস্ত কিছু দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে সেই ১৯৯০ সাল থেকে। তারপর ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রক্রিয়া বেগবান হতে হতে চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। তারই একটা উদাহরণ হল— 'খনি ও খনিজ দ্রব্য (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী বিল, ২০২৬' বা এম এম ডি আর সংশোধনী আইন।

এ বছর ১২ আগস্ট বিরোধী বেঞ্চের প্রবল প্রতিবাদের মধ্যে, কোনও আলোচনা ছাড়াই এই আইন লোকসভায় পাশ হয়েছে। পরদিন রাজ্যসভাও তাতে অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে।

এই আইন দেশের খনিজ সম্পদের উপর দেশের কৃষক ও আদিবাসীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে তাঁদের জমির উপর অধিকার। কোনও সংসদীয় কমিটি এই আইনকে পরীক্ষা করে দেখেনি। কোনও রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করা হয়নি। যাদের জমি ও জীবিকা সরাসরি বিপন্ন হতে চলেছে, সেই কৃষক ও জমির মালিকরা কিছুই জানতে পারেননি। বাস্তবে শুধু গায়ের জোরে, সংখ্যার জোরে আইনটিকে পাশ করিয়ে নেওয়া হল।

সরকারের উদ্দেশ্য যদি স্বচ্ছ হত, তবে তারা প্রকাশ্যে তা নিয়ে বিতর্ক করতে ভয় পেত না। কিন্তু বিজেপি সরকার জানে, জনগণের স্বার্থরক্ষা এই আইনের উদ্দেশ্য নয়, বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষাই এর উদ্দেশ্য। তাই যতটা সম্ভব চুপিসারে, বিতর্ক এড়িয়ে বিল পাশ করিয়ে নিতে সচেষ্ট তারা।

আইনের প্রকৃত চরিত্র

১৯৫৭ সালের 'খনি ও খনিজ দ্রব্য (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ)' সম্পর্কে যে মূল আইন ছিল, এই নতুন আইন তাকে সংশোধন করেছে। এতে মাত্র পাঁচটি ধারা আছে। তবে এর আকার ছোট হলেও এর প্রতিটি ধারাই রাজ্যগুলির কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার

চারের পাতায় দেখুন

শাসকদলের পূর্ণ মদতেই

একের পাতার পর

না নির্বাচন কমিশনে।

জ্ঞানেশ কুমার তবে কার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেছেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব থাকার সময় তিনি সংসদকেও কার্যত অন্ধকারে রেখে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পরিকল্পনা তৈরি, রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট গঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাকে প্রশাসনিক স্তরে রূপ দেওয়ার কাজ দক্ষতার সাথে করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, ২০১৯ সালে কেরলার প্রাক্তন মুখ্য সচিবকে বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরামর্শ দেন তিনি, মন্ত্রীত্বের সম্ভাবনার কথাও বলেন। এ ভাবে জ্ঞানেশ কুমার বিজেপির সেবকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। রাজ্যে রাজ্যে সরকার দখলের জন্য বিজেপি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে, জ্ঞানেশ কুমারের উপর দায়িত্ব দিয়ে কার্যত দলীয় কর্মীর মতো ব্যবহার করে ওই পদকেই অসম্মান করেছে।

যে ১৩ কোটি মানুষকে 'অনাগরিক' করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বিজেপির নেতামন্ত্রীরা গলা ফাটিয়ে বলে গেছেন— এরা 'দেশবিরোধী', 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী', 'রোহিঙ্গা'। এতদিন দেখা যাচ্ছিল ভোটার তালিকা থেকে কত নাম বাদ যাবে তা বিজেপি নেতারা আগাম বলে দিতে পারছিলেন। মানুষ অবাক হয়ে ভাবত, কী করে সম্ভব! আজ স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশন বিজেপির দপ্তরে পরিণত হয়েছে বলেই তাঁদের পক্ষে এগুলো বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল। তাই নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে যখন সমালোচনার ঝড় উঠছে, তখন নির্বাচন কমিশন কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা নেত্রী মুখপাত্ররা ব্যাকুল হয়ে তার জবাব দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে যে অন্ততপক্ষে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করা দরকার সে কথা বলছেন এ রাজ্যের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য! কারণ কী? পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাটা গেছে প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার। পরিসংখ্যান বলছে, এ রাজ্যে বিজেপির জয়ের ব্যবধান প্রায় ৩৩ লক্ষ।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল। তিরুবনন্তপুরম, কেরালা। ২৬ সেপ্টেম্বর

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ৪৯টি আসনে জয়ের ব্যবধানের থেকে ডিলিটেড ভোটারের সংখ্যা বেশি। বিহারে প্রায় ৪৭ লক্ষ মানুষ ভোট প্রয়োগের অধিকার হারিয়েছেন। বিহারের ২৪টি আসনে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ২০২৪-এ লোকসভা ভোটের জয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ এই বাদ পড়া ভোটাররা নির্বাচনের ফলাফলে অন্যতম নির্ণায়ক শক্তি।

বোঝা যাচ্ছে, কেন ২০২৩ সালে একশো জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করে তড়িঘড়ি লোকসভায় 'নির্বাচন কমিশন নিয়োগ বিল' উত্থাপন করেছিল মোদি সরকার। কার্যত বিরোধীশূন্য অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের রায় বদলে দিয়ে এই বিলকে আইনে পরিণত করা হয়েছিল। নতুন আইন অনুযায়ী মুখ্য ও অপর দুই নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মনোনীত কোনও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা নির্বাচক কমিটির অন্তর্ভুক্ত হন। গণতন্ত্রের বাইরের ঠাট বজায় রাখতে বিরোধী দলনেতাকে নির্বাচক কমিটিতে রাখলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনাররা যে শাসক শিবিরের মনোনীতই হবেন তা বলাই বাহুল্য।

তাই দেখা গেল, বিজেপি 'অনুপ্রবেশ', 'অনুপ্রবেশ' করে যত চিৎকার করেছে নির্বাচন কমিশন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিত্যনতুন নিয়ম পরিবর্তন করে, আবেদনপত্রের বিন্যাস পাল্টে দিয়ে, সেই বক্তব্যেই সিলমোহর দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে এসআইআর-এর প্রথম ধাপে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম বাদ যায়। বিজেপি নেতারা অনুপ্রবেশকারীর যে সংখ্যা দাবি করছিলেন, তার তুলনায় নির্বাচন কমিশনের বাদ দেওয়া নামের সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় কমিশন ঝাঁপিয়ে পড়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অদ্ভুত তত্ত্ব এনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে একটা বড় অংশের নাগরিকদের বিচারাধীন বলে চিহ্নিত করার কাজে। শেষপর্যন্ত প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

কিন্তু শুধু কি নির্বাচন কমিশন? বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যাপক বিক্ষোভকে সামাল দিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের কিছু সাধারণ পদক্ষেপের সমালোচনা করে তা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে পদ্ধতিতে কমিশন এসআইআর পরিচালনা করছে এবং তার ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে সেই সম্পর্কে নীরবই থেকেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া নাগরিকদের শুনানির ক্ষেত্রে ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। মূলত কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এ ছাড়াও দেড়শো জন বর্তমান ও প্রাক্তন জেলা জজকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে এই যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল, তার কাজের অগ্রগতি কেমন? পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর ট্রাইব্যুনালে মুর্শিদাবাদ থেকে সর্বোচ্চ— ৭ লক্ষ ৪৮ হাজারের কিছু বেশি আবেদন জমা পড়েছে। এ পর্যন্ত ফয়সালা হয়েছে মাত্র ৫৯৫টি, অর্থাৎ ০.১ শতাংশ। মালদহে প্রায় ৫ লক্ষ ৩১ হাজার আবেদনপত্রের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১৬১০টি, অর্থাৎ ০.৩ শতাংশ। এই গতিতে কাজ চললে সমস্ত আবেদনের নিষ্পত্তি হতে অন্তত ১২ বছর সময় লাগবে বলে অনুমান। নাম বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের যে আশঙ্কা-হতাশা, এতগুলি বছর ধরে তা কি তাঁরা বয়ে নিয়ে চলবেন? এই মানুষগুলির দিকে আদালতের কি সত্যিই নজর আছে? গোটা এসআইআর প্রক্রিয়াটি নাগরিকদের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি করেছে, ব্লক লেভেল অফিসারদের সীমিত সময়ের মধ্যে নিত্যনতুন অভিনব নির্দেশিকা দিয়ে যে ভাবে চাপে ফেলা হয়েছে,

এসআইআর বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ। কৃষ্ণনগর, নদিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর

তাতে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। এর দায় কার? ভোটের দিন রক্তপাত সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম না হলেও প্রাক-ভোট পর্বে শতাধিক মৃত্যু ভারতের ইতিহাসে কখনও ঘটেছে? নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা, মহামান্য আদালত— এর উত্তর দেবেন কি? এখন দেখা যাচ্ছে, দুই কমিশনার আগেই বলেছিলেন, নাম তোলার ফর্ম ৬-এ বেআইনি পরিবর্তন সহ নানা বেআইনি কাজ এসআইআর-এর সময় হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ইআরও-দের ইসিআই নেট অ্যাপে কার্যত ঢুকতে না দিয়ে নির্বাচন কমিশনের আইটি সেলের প্রধান এবং মুখ্য কমিশনারই বেআইনি ভাবে নাম তোলা ও কাটার কাজ করেছেন। এমনকি রাজ্য সিইও-রাও কোনও কিছুতে হস্তক্ষেপ করতে পারেননি। সমস্তটাই চরম বেআইনি। কিন্তু আদালতও এই বেআইনি কাজের প্রতি চোখ বুজে থাকল কী করে— এ প্রশ্ন উঠছে।

আজ দেখা যাচ্ছে আদালত, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি শাসকদলের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ অনেকাংশেই কায়েম হয়েছে। ধীরে ধীরে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্য তাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস বিজেপিকে তারা দায়িত্ব দিয়েছে। এ জন্য তারা উগ্র হিন্দুত্ববাদ-মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে অধুনা 'অনুপ্রবেশ তত্ত্ব' খাড়া করছে। যে কোনও বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দিয়ে এই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দিতে সংবাদমাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনকে কাজে লাগাচ্ছে তারা। তবে আশার কথা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সব মানুষ মুখ বুজে এগুলি সহ্য করছেন না। সাংবাদিকদের কেউ কেউ সত্য উদঘাটনে এগিয়ে আসছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ ও সমস্ত বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে ছাত্র-যুবক-মহিলারা পথে নামছেন। পুলিশি নিপীড়ন, জল কামান উপেক্ষা করে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। চাপে পড়ে মামুলি কিছু নিয়ম পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বিবৃতি দিয়ে জানাতে বাধ্য হচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গে যারা ভীত, দাবানলে তাদের ভিত কেঁপে উঠবেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শক্তিশালী গণআন্দোলনই পারে একদিকে সমস্ত কুকর্মের নায়ক জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে, তেমনই ১৩ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এসআইআর বাতিল করতে।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা থানার কুলাডাবর গ্রামে এসইউ সিআই(কমিউনিস্ট)-এর আবেদনকারী সদস্য কমরেড পার্থ ব্যানার্জী ৫ সেপ্টেম্বর নিজের বাড়িতে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ছাতনা ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে যখন দলের কাজ শুরু হয় তখন তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়ার সুবাদে কমরেড বাদশা খান, কমরেড মাধব রায়চৌধুরী প্রমুখ নেতৃত্বের সান্নিধ্য পান। কলেজে পড়াকালীন এআইডিএসও-র সাথে তিনি যুক্ত হন। পড়াশোনার শেষে এলাকায় দলের কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি দলের আবেদনকারী সদস্যপদ পান। ঐতিহাসিক ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর আন্দোলনেও তিনি অংশ নিয়েছেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও স্পষ্টভাষী। এলাকায় কংগ্রেসি অপশাসন, সিপিএম সরকারের অবাম ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং তৃণমূলের চুরি-দুর্নীতির প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি নিয়মিত দলের বই ও মুখপত্র পড়তেন এবং অন্যদেরও দিতেন। চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনাতে তিনি ভূমিকা নিতেন।

২০ সেপ্টেম্বর আড়াজুড়ি বিদ্যাসাগর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে কমরেড পার্থ ব্যানার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন নাগ, দলের প্রবীণ শিক্ষক নেতা কমরেড দোলগোবিন্দ রক্ষিত সহ অন্যরা স্মৃতিচারণ করেন। সভায় সিপিআই(এম)-এর স্থানীয় প্রতিনিধি বলেন, কমরেড পার্থ ব্যানার্জী তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি অন্য দলের নেতাদেরও সম্মান দিতেন, যা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাওয়া যায়।

কমরেড পার্থ ব্যানার্জী লাল সেলাম

গণদাবীতে প্রকাশিত লেখার ভাল-মন্দ সম্পর্কে মতামত দিয়ে চিঠি পাঠান
পাঠকের মতামত, ই-মেল ঃ ganadabi@gmail.com

বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকেই আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন

মাও সে তুং

... বাস্তব পরিস্থিতির অনুসন্ধানের ও অধ্যয়নের পরিবেশের অভাব আমাদের রয়ে গেছে। চোখ-বাঁধা একজন মানুষের চড়ুই পাখি ধরা'র মতো। অথবা একজন অন্ধের হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরা'র মতো আচরণ করা, গোঁয়ারের মতো ও অসতর্ক হয়ে কাজ করা, বাগাড়ম্বরকে প্রশ্রয় দেওয়া, আধ খেঁচেড়া জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা— এই সবই আমাদের পার্টির অনেক কমরেডের মধ্যে এখনও বর্তমান। অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজের সেই ধারা যা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অধ্যয়ন করা প্রয়োজন এবং আত্মগত খেয়ালখুশি থেকে নয়, বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকেই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড এই সত্যকে সোজাসুজি লংঘন করেই কাজ করে থাকেন।...

আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা বা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্যের অধ্যয়নের কথাই ধরা যাক। অনেক কমরেডকেই দেখা যায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের যে অধ্যয়ন তাঁরা করেছেন তা বৈপ্লবিক প্রয়োগের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য নয়, শুধু অধ্যয়নের জন্যই সে অধ্যয়ন তাঁরা করছেন। ফলে অধ্যয়ন যদিও তাঁরা করেন, তাকে হজম করতে তাঁরা পারেন না। একপেশে ভাবে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতিই তাঁরা শুধু হাজির করেন।

কিন্তু মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিনের অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিকে চিনের বর্তমান পরিস্থিতি ও তার ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বা চিন বিপ্লবের সমস্যার বাস্তব বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন না। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি এ ধরনের মনোভাব বিশেষ করে মাঝারি ও উচ্চতর স্তরের কর্মীদের পক্ষে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের শিক্ষার সংস্কার সাধন,
মে ১৯৪১
(নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড)

ভারতে শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে
আরএসএস-লিগকে হাতের পুতুলের মতো ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ সরকার

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ঃ ফিরে দেখা (৫)

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটি আজ যে রূপ পেয়েছে তার পিছনে যেমন ব্রিটিশ শাসকদের 'বিভেদ ও শাসন' নীতি এবং ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের ইতিহাস বিকৃতির প্রভাব কাজ করেছে, তেমনই ভারতের জাতীয়তাবাদী তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের আদর্শগত ক্ষেত্রে আপসকামিতাও তার জন্য দায়ী। ব্রিটিশের শত বাধা সত্ত্বেও আন্দোলন যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছে, কিংবা তুঙ্গে উঠেছে, তখন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিও তাদের কার্যকলাপ স্তিমিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপের দেশগুলিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম যুগে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়ার ফলে রাষ্ট্র, জাতি, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সব কিছুকে সামন্ত যুগের ধর্মীয় বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-প্রদেশ নির্বিশেষে ভারতীয় এক জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি এমন এক সময়ে শুরু হয়েছে যখন একদিকে দেশের অভ্যন্তরে চলছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসন, অন্য দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করার মধ্য দিয়ে দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দখলদারি, শোষণ-লুণ্ঠনের পক্ষে কাজ করছে। এই অবস্থায় ভারতের জাতি গঠনের প্রক্রিয়াটি স্বাধীন ভাবে আপসহীন পথে গড়ে উঠতে পারেনি। তা একদিকে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে অন্য দিকে সমাজ জুড়ে টিকে থাকা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, রীতিনীতি এবং ধর্মের সাথে আপস করেছে। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে, তাতে তারা আপসের পথেই এগোতে চেয়েছে। বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যে যৌবনোদ্দীপ্ত আপসহীন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের ধারা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে আপসহীন বিপ্লবাত্মক চিন্তার জন্ম দিলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পুঁজির আপসমুখী চরিত্রের জন্য আপসমুখীতাই প্রধান ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বড় অংশই ধর্মভিত্তিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত থেকে গিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সব নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিচারে, জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে, ঐতিহাসিক নানা সমস্যা বিষয়ে অথবা ভারতীয় সমাজ গঠন সম্পর্কে বা সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বিষয়ে তাঁরা গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে পারেননি। এই কারণেই দেশের সব সম্প্রদায়কে একত্রিত করে সব দিক থেকে এক জাতি গঠন সম্ভব হয়নি। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে, বিশেষত মুসলিম জনসাধারণকে আন্দোলনের সাথে সামিল করে একটি জাতিগঠনের প্রচেষ্টা প্রবল ধাক্কা খায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ সফল করবার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতৃত্বকে ধর্মীয় সংস্কারের ওপরে ওঠা উচিত ছিল। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিতে চাইলেও তাদের আপসকামী চরিত্রের জন্য তারা তা সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে যুক্ত করে ব্যাপক গণআন্দোলনের পথে তা চাননি, চেয়েছেন আবেদন নিবেদন, সংস্কারবাদী আন্দোলনের পথে। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস নেতৃত্বও সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস এবং বিরুদ্ধতার নীতি (সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী) নিয়েই চলেছে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপ্লবাত্মক পথে হলে সব স্তরের ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করতে পারত

ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-প্রদেশ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু যাঁরা এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেই সংগঠন ও তার নেতাদের আদর্শগত সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতার কারণে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের সব স্তরের মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। আদর্শগত ক্ষেত্রে এই শূন্যতার সুযোগে সাম্প্রদায়িকতা সমাজে জায়গা করে নেয়। জাতি গঠনের এই প্রক্রিয়ায় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের একাত্ম-চেতনার প্রয়োজন ছিল, অথচ নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভিত্তি করে এই ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ফলে ঐক্যের ভিত্তি সন্ধান করতে গিয়ে দরকার হল পুরনো, অধিকতর পরিচিত একতাবোধের। অর্থাৎ জাতীয় চেতনার পরিবর্তে ধর্ম, বর্ণ, উপজাতি, ভাষা, আঞ্চলিকতাকে কেন্দ্র করে খণ্ড খণ্ড ঐক্যচেতনা গড়ে উঠল— নতুন পরিস্থিতিতে তা যতই অনুপযুক্ত ও অবৈজ্ঞানিক হোক না কেন।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলন

বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯০৫-এ গভর্নর জেনারেল তথা বড়লাট লর্ড কার্জন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাকে দুর্বল করতে পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। দেশ জুড়ে শুরু হয় বিদেশি দ্রব্য বয়কট আন্দোলন। ১৯০৬-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বয়কট, স্বদেশি শিক্ষা এবং স্বরাজের প্রস্তাব নেওয়া হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে প্রতিদিন শোভাযাত্রা বের করে। এই শোভাযাত্রা ঠেকাতে বাংলার মুখ্যসচিব টমাস কার্লাইল এক সার্কুলার জারি করেন। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ও দেশের মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগায়।

স্বদেশি আন্দোলন বাংলায় তীব্র আকার নেয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি খবরের কাগজগুলি, লেখক, কবি, গায়ক, নাট্যকাররাও বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। আন্দোলনে বাংলার পাশাপাশি পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তীব্র রূপ নিলে সরকার সভা-সমাবেশ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করতে ১৯০৭-এ প্রিভেনশন অফ সেডিসাস মিটিংস অ্যাক্ট নিয়ে আসে। ১৯০৮-এর ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা ছোঁড়েন। ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এ ঘটনা সারা দেশের মানুষের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।

মহারাষ্ট্রেও সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালায়। দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেশরী পত্রিকায় একটি লেখার জন্য বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেফতার করে ছ'বছরের জন্য বার্মার জেলে নির্বাসিত করা হয়। তিলকের সাজার বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভ হয়। মুম্বইয়ের শ্রমিকরা হরতাল করে। ভারতের ইতিহাসে এই হরতাল শ্রমিকদের প্রথম রাজনৈতিক হরতাল বলে পরিচিত। এ দিন মুম্বইয়ে পুলিশের গুলিতে ১৫ জন নিহত ও ২৮ জন আহত হয়।

আন্দোলন ভাঙতে বিভেদের চাল

সমগ্র দেশ জুড়ে যখন এই ভাবে আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ বইছে তখনই ব্রিটিশ শাসকরা ডিভাইড অ্যান্ড রুল (বিভক্ত করো এবং শাসন করো) নীতির চাল চালে। তাদের প্ররোচনায় আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দল লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ

ছয়ের পাতায় দেখুন

খনিজ সম্পদ ধনকুবেরদের হাতে

একের পাতার পর

জন্য তৈরি হয়েছে, প্রতিটি ধারাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী।

প্রথমত, এটি মূল আইনের ২ নম্বর ধারাকে পরিবর্তন করে সরকার 'খনির নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন' নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবে। কথাগুলির সাথে 'এবং খনিজ সমৃদ্ধ জমি' (and mineral bearing lands) এই চারটি শব্দ যোগ করার মাধ্যমে শুধু খনি এবং খনিজ দ্রব্য নয়, যে জমিতে মানুষ বাস করে, কৃষিকাজ করে, সেই জমিও সরাসরি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে 'খনিজ সমৃদ্ধ জমি' বলতে বোঝাবে 'কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী খনিজ উপাদান যুক্ত যে কোনও জমি'। লক্ষ করুন— 'যে কোনও জমি'। কোন জমির এই যোগ্যতা আছে তা সংসদ, রাজ্য বিধানসভাও ঠিক করবে না, আর গ্রামসভার তো প্রশ্নই ওঠে না। তা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের সুবিধামতো নিয়ম (রুলস) তৈরি করে তারাই ঠিক করবে কোন জমি নেওয়া হবে। কতটা খনিজ থাকলে তা নেওয়া হবে বা কতটা বিস্তৃত এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত হবে, তার কোনও মাপকাঠি বা সংজ্ঞা আইনে দেওয়া হয়নি। এই আইন বলে কেন্দ্রীয় সরকার আগামীকালই সিদ্ধান্ত নিতে পারে— এই বনাঞ্চল, এই নদীতীর, এই উপকূলীয় এলাকা বা খনিজ সম্ভারের উপর অবস্থিত এই কৃষিপ্রধান গ্রাম হল 'খনিজ সমৃদ্ধ জমি' এবং এই সিদ্ধান্তের বলে সেই জমিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যাবে।

তৃতীয়ত, এই নতুন (৯ডি) ধারা যুক্ত করে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের শর্তের বাইরে 'খনিজ অধিকার বা খনিজ সমৃদ্ধ জমির' উপর রাজ্য সরকার কোনও ট্যাক্স, সেস বা এই ধরনের অন্য কোনও শুল্ক (যে নামেই ডাকা হোক না কেন) বসাতে পারবে না।

চতুর্থত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল— ডি-২ ধারা। এই ধারা শুরু হয়েছে এই কথা দিয়ে— 'বর্তমানে বলবৎ কোনও আইনে, অথবা আদালতের কোনও রায়, ডিক্রি বা আদেশে যা-ই থাকুক না কেন— রাজ্য সরকার যে সব শুল্ক এখনও আদায় করতে পারেনি, তা 'চিরকালের জন্য বাতিল বলে গণ্য হবে'। তবে রাজ্যগুলো এর মধ্যেই যা আদায় করে ফেলেছে, 'তা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই'।

আদালতের কোন রায়ে আপত্তি

আদালতের যে রায়ে আপত্তি, সেটি হল— ২০২৪ সালের ২৫ জুলাই, 'মিনারেল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বনাম স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত রায়। এই রায়ে মাটির নিচের খনিজ সম্পদের ওপর রাজ্যের কিছুটা অধিকার স্বীকার করে বলা হয়েছিল— রয়ালটি কোনও কর নয়, খনিজ অধিকারের ওপর কর বসানোর ক্ষমতা রাজ্যগুলির আছে এবং জমির ওপর কর বসানোর ক্ষমতা খনিজ সমৃদ্ধ জমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আদালত রাজ্যগুলোকে ২০০৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের অনুমতি দিয়েছিল। তাতে বলা হয়— ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে বারো বছরের মেয়াদে বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। শিল্প দপ্তরের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, এই বকেয়ার পরিমাণ ছিল ১.৫ লক্ষ কোটি থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা।

কথা ছিল ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই বকেয়া মেটানো শুরু হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, নতুন আইন তৈরি করার জন্য বিল সংসদে পেশ করা হল ২০২৬ সালের ১০ আগস্ট! আমাদের প্রশ্ন হল, এত তাড়াহুড়ো কাদের স্বার্থে এবং কেন? এখন কোনও সংস্থা রাজ্য সরকারের বকেয়া পরিশোধ না করলেও রাজ্য সরকার সেই টাকার দাবি আর করতে পারবে না। কিন্তু অন্য কোনও সংস্থা যদি একই বকেয়া সময়মতো মিটিয়ে দিয়ে থাকে, তবে তারা আর সেই টাকা ফেরত পাবে না। সুতরাং, যে সংস্থা আইন মোতাবেক কাজ করেছে তার ক্ষতি হল। আর যে সংস্থা মামলা চালিয়ে গেছে, বকেয়া টাকা দিতে অস্বীকার করেছে, সে অনায়াসে ছাড় পেয়ে গেল। এই আইন শুধু খেলাপিদের মাফই করছে না, বরং তাদের পুরস্কার দিচ্ছে এবং যারা আইন মেনেছে তাদের শাস্তি দিচ্ছে।

প্রশ্ন হল, বছরের পর বছর কারা রাজ্য সরকারের বকেয়া টাকা মেটায়নি? তারা হল বড় বড় খনি কর্পোরেশন। তারা রাজ্য সরকার নির্ধারিত কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অনন্তকাল মামলা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং তারাই রাজ্য সরকারের বকেয়া টাকা দেয়নি।

যে লুঠ করতে পারবে তাকে মদত দাও। অর্থাৎ, এই আইন বলছে, সরকারের প্রাপ্য টাকা না দেওয়াটাই এখন বুদ্ধিমানের বাণিজ্যিক কৌশল আর আইন মেনে চলা ব্যয়বহুল বোকামি।

ক্ষতি সাধারণ মানুষের

কিন্তু এটা কেবল সরকার ও কোম্পানিগুলোর হিসাব-নিকাশের বিষয় নয়। রাজস্ব হল জনগণের টাকা। এই টাকাতেই রাস্তা, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র,

সাতের পাতায় দেখুন

আব্দুল ওদুদ স্মৃতি ভবনে শরৎ লাইব্রেরি উদ্বোধন

নদিয়া জেলায় বামপন্থী গণআন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন আব্দুল ওদুদ। ১৯৯৮ সালে তিনি তদানীন্তন শাসক দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত হন।

শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে নদিয়ার বারুইপাড়া বাজারে শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতি ভবনে মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেড়শো বছর পূর্তিতে ১৮ সেপ্টেম্বর 'শরৎ লাইব্রেরি'র উদ্বোধন হয়। আলোচনা করেন শহিদ আব্দুল ওদুদের বাল্যবন্ধু এস ইউ সি আই (সি)-র নদিয়া উত্তর পূর্বতন জেলা সম্পাদক মহিউদ্দিন মান্নান মণ্ডল।

প্রধান আলোচক ছিলেন সারা বাংলা শরৎচন্দ্র সার্ধশতবর্ষ কমিটির সদস্য কৌশিক চ্যাটার্জী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের নদিয়া উত্তর জেলা ইনচার্জ হররোজ আলি সেখ। উপস্থিত ছিলেন শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড ইসমত আরা খাতুন। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি এম রহমতুল্লা।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভ

অবিলম্বে সমগ্র এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল করা, দেশজোড়া বাদ যাওয়া ১৩ কোটি ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় অবিলম্বে অন্তর্ভুক্তি, বাদ পড়া ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করেই কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন করা সহ অন্যান্য দাবিতে সহস্রাধিক মানুষের এক সুসজ্জিত মিছিল ২৮ সেপ্টেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির সামনে পৌঁছলে পুলিশ মিছিল আটকায়। সেখানে এক সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শংকর ঘোষ। তিনি জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করেন। প্রাক্তন বিধায়ক, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তরুণ নস্করের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সিইও দপ্তরে অ্যাডিশনাল সিইও-র সাথে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

২০ দফা দাবিতে জঙ্গিপুরে প্রতিবন্ধীদের বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে কুড়ি দফা দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে দেড় শতাধিক প্রতিবন্ধী মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করে এসডিও-কে ডেপুটেশন দেন।

প্রতিবন্ধীদের ভাতা ৫০০০ টাকা করা, তাঁদের অন্নপূর্ণা, অন্ত্যোদয় যোজনা কার্ড প্রতিবন্ধীদের দেওয়া, লোকাল এবং স্টেট বাসে ভাড়া নিয়ে হয়রানি বন্ধ করা, এসআইআর-এ যে সমস্ত প্রতিবন্ধীর নাগরিকত্ব বাদ পড়েছে তাঁদের দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়া, চাকরির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ, মহিলা প্রতিবন্ধীদের নির্যাতন ধর্ষণ রুখতে কড়া পদক্ষেপ প্রভৃতি দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়। মঞ্চের জেলা সম্পাদক সুমন পাল এবং জেলা সভাপতি বরজাহান শেখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিডিও প্রতিশ্রুতি দেন, যে সমস্ত বিষয়গুলো তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে, তা কার্যকর করার চেষ্টা করবেন।

হকার্স কমিটি গঠন বেলেঘাটায়

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সহায়তায় কলকাতায় বেলেঘাটা-ফুলবাগান এলাকায় হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী করার আহ্বান নিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর এলাকার হকারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শান্তি ঘোষ।

তিনি বলেন, আজকের এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষত কলকাতায় যে হকার ভাইরা রয়েছেন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং পাশাপাশি অধিকার আদায়ের সংগ্রামও চলবে।

সভা থেকে মানস মুখার্জীকে সভাপতি ও দুলাল দেবনাথকে সম্পাদক করে ২৩ জনের হকার্স কমিটি গঠিত হয়। শেষে সকল হকার সদস্যদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয়।

এসআইআর বাতিলের দাবি

একের পাতার পর

অপসারণ করতে হবে, অবিলম্বে সমগ্র এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধকরতে হবে, এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া ১৩ কোটি ভোটারের নাম অবিলম্বে ভোটার তালিকায় পুনর্বহাল করতে হবে।

রাজ্যে ৯৩৩টি স্কুল বন্ধে শিক্ষার বেসরকারিকরণের রাস্তা প্রশস্ত হবে

রাজ্যে ৯৩৩টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্যে ৯৩৩টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ছাত্র-শূন্য হওয়ার অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে অথচ স্কুলে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে না— তার কারণ হল উক্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষক অপ্রতুল এবং পরিকাঠামোর দৈন্যদশা। ফলে অভিভাবকরা বেশি অর্থ ব্যয়ে সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে সরকারি স্কুলগুলির এই শ্রীহীনতা একটা প্রায় সাধারণ চিত্র। সরকারের যখন উচিত ছিল পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে স্কুলগুলোকে চালু রাখা, তখন সরকার উল্টো পথে হেঁটে সেগুলিকে বন্ধ করে দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণের রাস্তা আরও প্রশস্ত হবে। আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে স্কুলগুলোকে চালু রাখার দাবি করছি। এ ছাড়া অন্য দুর্দশাগ্রস্ত স্কুলগুলোর হাল ফেরানোরও দাবি করছি।

ভোটাধিকারের দাবিতে বর্ধমানে নাগরিক কনভেনশন

ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি পূর্ব বর্ধমান জেলার (প্রস্তুতি কমিটির) পক্ষ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর বৈধ ভোটারদের অবিলম্বে তালিকাভুক্ত করার দাবিতে পাঁচ শতাধিক নাগরিকের উপস্থিতিতে

পূর্ব বর্ধমান জেলা নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে। সভাপতিত্ব করেন অরবিন্দ সাহা। শুরুতে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অনিরুদ্ধ কুণ্ডু। বিশিষ্টজনদের মধ্যে ডাঃ গৌরাঙ্গ মুখার্জী, ডাঃ তসবিরুল ইসলাম এবং সৈয়দ মুস্তফা আলি, অসিত ঘোষ, কাজি মুফাস্বর হোসেন, কুণাল বক্সী প্রমুখ আইনজীবীরা বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে ডাঃ গৌরাঙ্গ মুখার্জীকে সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক অরবিন্দ সাহা ও অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, কোষাধ্যক্ষ আইনজীবী নীলরতন বিশ্বাস সহ জেলার ২০ ব্লকের ৬৪ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। আগামী দিনে গ্রাম, ব্লকে ছোট ছোট বৈঠক ও কমিটি গঠন করা এবং আন্দোলন আরও জোরদার করার বার্তা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও এসআইআর-এ বাদ যাওয়া ১৩ কোটি ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করার দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের গুনায় এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য ইতিহাস অসচেতনতার ফল

২০৬তম বিদ্যাসাগর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ২৭ সেপ্টেম্বর বলেন,

শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে সংস্কৃতের উপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন, বিদ্যাসাগরের ইংরেজিতে দখল থাকলেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস সচেতনতা আমাদের বিস্মিত করেছে। কারণ, যে সংস্কৃত কলেজ ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে কাজ বিদ্যাসাগরকে করতে হলে তাঁকে ৪ বছর বয়সে করতে হত। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন বিদ্যাসাগর ত্রিভাষা নীতির পক্ষে ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজির পক্ষে ছিলেন। আসলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনে ইংরেজি ও বাংলা ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সংস্কৃত ততটুকুই শিখতে হবে যতটুকু বাংলা ভাষার বিকাশের জন্য প্রয়োজন। এমনকি তিনি সংস্কৃতে লীলাবতীর বীজগণিত বাদ দিয়ে ইংরেজিতে বীজগণিত চালু করেছিলেন, তাতে শিখতে সুবিধা হবে বলেই। তৃতীয়ত, শিক্ষামন্ত্রী রাষ্ট্রবাদী ভাবনায় বিদ্যাসাগরের চর্চা করার কথা বলেছেন। তাঁদের রাষ্ট্রবাদী ধারণা সাভারকারের 'হিন্দুত্ব' ভাবনার অনুসারী। অথচ বিদ্যাসাগর ১৮৫১ সালেই বলেছিলেন, সাংখ্য-বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন— এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তাই সংস্কৃত কলেজে প্রাচ্য দর্শনের পরিবর্তে জে এস মিলের দর্শন, বীজগণিত, পলিটিকাল ইকনমি, ন্যাচারাল ফিলজফি প্রভৃতি আধুনিক বিষয় পড়ানোর কথা বলেছিলেন। ফলে রাষ্ট্রবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসাগরের চর্চার কথা বিভ্রান্তিকর।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যে ভাবে কর্তৃপক্ষের ফরমান উপেক্ষা করে 'নমো সেবা' নাটক মঞ্চস্থ করতে অস্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন।

২৬ সেপ্টেম্বর মহান মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭তম জন্ম দিবসে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্কুল খোলার দাবি তুলে ধরেন ছাত্রছাত্রীরা

হলদিয়ায় নাগরিক কনভেনশন

নিম্নচাপজনিত অতি বর্ষণে হলদিয়া পৌরসভা, সুতাহাটা ও হলদিয়া ব্লক এলাকায় মাসাধিককাল ধরে বর্ষার জল জমে রয়েছে। এলাকার জলনিকাশি খাল, লকগেট ও স্লুইস গেটগুলির অবিলম্বে পূর্ণ সংস্কার সহ নিকাশি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর সুতাহাটায় নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ দাস। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শ্যামসুন্দর দাস। বক্তব্য রাখেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, কমলেশ চক্রবর্তী, প্রশান্ত দাস, শংকর গায়েন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন শুভেন্দু শেখর দাস।

কনভেনশন থেকে বিজয়কৃষ্ণ দাসকে সভাপতি ও নিখিলেশ দোলই, শ্যামসুন্দর দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে 'হলদিয়া নিকাশি সংস্কার কমিটি' গঠিত হয়। জেলা ও মহকুমা শাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, এইচডিএ কর্তৃপক্ষ এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়।

ক্যাম্পাসে হামলার বিরুদ্ধে কনভেনশন

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি কলেজ সহ এরাজ্যের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ব্যাপকভাবে চলছে বিজেপি ও তাদের ছাত্র শাখা এবিভিপি আশ্রিত গুণ্ডাদের আক্রমণ। এই দুষ্কৃতীরা ক্যাম্পাসে ঢুকে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। এদের হাত থেকে ক্যাম্পাসকে রক্ষা করতে গিয়ে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে এআইডিএসও সহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সংগঠকেরা। এই সন্ত্রাস ও দখলদারির রাজনীতির বিরুদ্ধে ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার বীরেন্দ্র মঞ্চেসংগঠিত হল নাগরিক কনভেনশন (ছবি)।

বক্তব্য রাখেন মনো-সমাজকর্মী মোহিত রণদীপ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত দাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, ডিওয়াইএসএ-র প্রতিনিধি উদিতা বেদজ্ঞ, পিডিএসএফ রাজ্য সভাপতি শিল্পক মুখার্জী, এআইএসএফ রাজ্য সভাপতি সৌমেন হালদার, এআইএসবি রাজ্য সম্পাদক সাফিউল হাসান, পিএসইউ রাজ্য সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস, এসএফআই রাজ্য নেতা হাসিব হোসেন, এআইএসএ-র রাজ্য সভাপতি ঋতম মাজী, এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ অপূর্ব মণ্ডল।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজেপি-এবিভিপির দখলদারি রুখতে গিয়ে তাদের হাতে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা। একই ভাবে ১৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি শহরে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার রায় অভয়া আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ অনিকেত মাহাতো। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় সহ এসএফআই এবং পিএসইউ-এর রাজ্য নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন।

আরএসএস-লিগকে ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ

তিনের পাতার পর

করে মুসলমানদের জন্য ভোটের বিশেষ অধিকার দাবি করে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার বিশ্বস্ততার চরিত্র দেখিয়ে দেয়। মুসলিম লিগ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এবং ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর করার জন্য ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী আরও এক পা অগ্রসর হয়। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন এনে মুসলমান, জমিদার এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে বিধান পরিষদে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি পৃথক ভাবে পাঠানোর অধিকার দেয়। এ একদিকে যেমন ছিল মুসলমানদের সুবিধা দিয়ে জাতীয় আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেওয়ার হীন কৌশল, তেমনই জমিদার, সামন্তপ্রভু এবং বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের পক্ষে এনে বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধিতার এক ষড়যন্ত্র।

ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লিগ সক্রিয় হতেই পাল্টা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। বহু লেখক এবং রাজনৈতিক কর্মী এর সুদূরপ্রসারী ভয়ঙ্কর পরিণাম উপলব্ধি করতে না পেরে অথবা বুঝলেও নানা সঙ্কীর্ণ হিসেব-নিকেশ থেকে মুসলিম লিগের পাল্টা হিন্দু ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতামূলক কাজকর্ম শুরু করে দেন। তাঁরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধুয়া তোলেন, মুসলমানদের 'বিদেশি' বলে প্রচার চালাতে থাকেন। মুসলিম লিগের অনুকরণে এঁরা ব্যবস্থাপক সভা, পৌর প্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে দেন। ১৯০৯-এ পাঞ্জাবে হিন্দু সভা এবং ১৯১৫-র ৯ এপ্রিল হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৪-তে ভারতীয় জনগণের উপর এক বিরাট আক্রমণ হিসাবে নেমে আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশ এই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয় ভারতীয় জনগণের উপর। হাজার হাজার ভারতীয়কে সেনা বাহিনীতে নিয়োগ করে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের যুদ্ধ ফ্রন্টগুলিতে পাঠায় ব্রিটিশ। ব্রিটিশ যুদ্ধে জয়ী হলে কৃতজ্ঞতা হিসাবে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবে, ব্রিটিশের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বাত্মক সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

যুদ্ধে ভারতীয় পুঁজিপতিরা বিপুল মুনাফা করেছিল। টাটারা বিদেশে রেললাইন ও নানা সরঞ্জামের বিপুল অর্ডার পেয়েছিল। জনগণ পেয়েছিল কুখ্যাত এবং বিনা বিচারে আটকের ফরমান রাওলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

ব্রিটিশ সরকারের এই প্রতারণার বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে সারা দেশ। জনগণ বহু জায়গায় নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ে। শ্রমিকরা বড় বড় ধর্মঘট সংগঠিত করে। কৃষকরা পাঞ্জাবে মহন্তদের বিরুদ্ধে অকালি আন্দোলনে নামে, মালাবারে মোপালা বিদ্রোহ, উত্তরপ্রদেশে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘঠিত হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ভারতের জনগণের মধ্যে বিরাট অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। কংগ্রেস নেতৃত্ব বাধ্য হন ১৯২০-২১ এর অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করতে। দেশের মানুষ যখন এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আইন অমান্য করে, খাজনা বন্ধ করে দেয়, ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়ে রাজপথে এসে জড়ো হয়, তখন হঠাৎই গোরখপুরের চৌরিচৌরায় পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত থানা আক্রমণের ঘটনাকে দেখিয়ে গান্ধীজি সারা দেশ থেকেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

গান্ধীজির আন্দোলন প্রত্যাহারের সুযোগে সাম্প্রদায়িক শক্তিবৃদ্ধি

মাঝপথে এই ভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে। গান্ধীজি তথা কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা এবং অবিশ্বাসের পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিকে সুচতুর ভাবে কাজে লাগায় শাসক ব্রিটিশ এবং হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি। ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৩-এ অমৃতসর, মুলতান, মীরাট, রায়বেরেলি, সাহারানপুর এবং ১৯২৪-এ দিল্লি, নাগপুর, লাহোর, লখনৌ, এলাহাবাদ, কোহাট প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা হয়। সংযুক্ত প্রদেশ জুড়ে ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এই সময়ে অন্তত ৯১টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। এই দাঙ্গার কাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভাকে হাতের পুতুলের মতো ব্যবহার করে। অথচ দেশের মানুষ সংগ্রামের জন্য সমস্ত দিক থেকে প্রস্তুত ছিল। শুধুমাত্র সঠিক নেতৃত্বের অভাবের জন্য দেশ গোলামির শৃঙ্খলেই আবদ্ধ থেকে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির ক্ষমতালাভের দৃষ্টান্ত ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণিকে বিপ্লবভীত করে তোলে। একচেটিয়া পুঁজির চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার সাথে আপস করতে থাকে।

সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ মননে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক চিন্তার বিস্তার ঘটায়। ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপক সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটায়। ১৯২৩-এ মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে বারাণসী সম্মেলনে কংগ্রেসের কিছু বিশিষ্ট নেতা সহ বিভিন্ন হিন্দু গোষ্ঠী একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়ে হিন্দু মহাসভা পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯২৫-এ মহাসভার অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি হন লালা লাজপত রায়। এই বছরেই হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে বি এস মুঞ্জে সহ আরও চার জন হিন্দুত্ববাদী নেতা মিলে তৈরি করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। তার আগে অবশ্য মুঞ্জে সহ এই নেতারা ইটালির ফ্যাসিস্ট নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। হেডগেওয়ার ছাড়া বাকিরা ছিলেন হিন্দু মহাসভারও নেতা। তাঁরা হিন্দু স্বয়ংসেবক সমিতি এবং হিন্দু সংরক্ষণ সমিতিরও নেতা ছিলেন। ১৯২৩-এ নাগপুরে এক দাঙ্গায় এই সমিতিগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল এবং দাঙ্গার পরে সমিতিগুলি মিলে নাগপুরে হিন্দু মহাসভা গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়াতেই গড়ে ওঠে আরএসএস। ১৯২৭-এ নাগপুরে আর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আরএসএস মুখ্য ভূমিকা নেয়। দাঙ্গার পর নাগপুর ও তার চারপাশে আরএসএসের সংগঠন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন সহ নানা বিক্ষোভে দেশ উত্তাল হয়ে উঠলেও আরএসএস ব্রিটিশ বিরোধী এ ধরনের সমস্ত আন্দোলন থেকে নিজেদের সচেতন ভাবে সরিয়ে রেখেছিল। ১৯৩০-৩১-এর দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলনেও তারা অংশ নেয়নি। এই আন্দোলন দেশের সর্বত্র তীব্র রূপ নিলে যেমন ব্রিটিশ শাসকরা, তেমনই জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব শঙ্কিত হয়ে পড়ে। গান্ধীজি মাঝপথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্য দিয়ে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির ব্যবস্থা হলেও স্বাধীনতার কোনও দাবিই আদায় হয় না। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা বা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়া বিপ্লবী এবং শ্রমিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। গান্ধীজির এই আপসকামী ভূমিকায় আবার দেশজোড়া ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগায় আরএসএস এবং মুসলিম লিগ। কংগ্রেসের বহু কর্মী আরএসএসের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং আরএসএস হিন্দু মহাসভা ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, কংগ্রেসকে আরএসএস, হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লিগে যোগদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হয়।

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী জাতীয়তাবাদ

এই সময় আর একটি বিষয় কিছু মানুষের মনে ধাক্কা দেয়। ভারতীয়রা দেশ শাসনের উপযুক্ত নয়, তাই বারে বারে তারা বিদেশি শক্তির পদানত হয়ে চলেছে— ব্রিটিশ শাসক এবং তাদের ধামাধরা ইতিহাসবিদদের এমন উদ্ভট প্রচারের উত্তরে একদল মানুষ 'ভারতীয়রাও উপযুক্ত' এটা প্রমাণ করতে অতীত ভারতের গৌরবে আশ্রয় নেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এই গৌরবময় অতীত থেকে ক্রমাগত অধঃপতনের কারণেই নাকি ভারতীয়রা বিদেশি আক্রমণকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। এঁরা মনে করতেন এই প্রাচীন অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার দ্বারাই এই অধঃপতনকে সংশোধন করা সম্ভব।

বাস্তবে এটা ছিল বৈজ্ঞানিক বিচার ও যুক্তিসম্মত চিন্তার বিপরীত ধারা। এই ধারা বৈজ্ঞানিক মনন তৈরির পরিবর্তে এক অতীন্দ্রিয়তাবাদী মানসিকতা তৈরি করছিল। ভারতের অতীত মহিমার দিকে এ ভাবে ধারাবাহিক দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে সাধারণের মধ্যে একটা মিথ্যা দম্ভ ও আত্মতুষ্টির মনোভাব তৈরি হয়। অতীতের 'স্বর্ণযুগ'-এর মোহ তৈরি হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার একটা অজুহাত গড়ে তুলল। এতে বাস্তবে জাতি গঠনের প্রক্রিয়াতে বাধা তৈরি হয়। অতীতবাদী ধ্যান ধারণার পুনরুজ্জীবনের ফলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল, এমনকি হিন্দু-সমাজের মধ্যেও উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। বহু ধর্মের মানুষের বাস যে দেশে সেখানে ধর্মের উপর সবটুকু গুরুত্ব আরোপের পরিণামে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসার ব্যাপকতর হয়। এই প্রশ্নে মনে রাখা জরুরি, অতীত যতই গৌরবময় হোক, সমাজ এগোয় উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে। অতীতের সবকটি যুগ থেকে যে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ, এটা অস্বীকার করা চলে না।

হিন্দুরাই প্রধান জাতি, মুসলিমরা অধীনস্থ— এক ভ্রান্ত ধারণা

হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির মধ্যে যাঁরা এই মহিমান্বিত অতীতের খোঁজ করছিলেন তাঁরা আদর্শগত ভিত্তি খুঁজে পেলেন ১৯২৩-এ সাভারকরের 'হিন্দুত্ব ঃ হিন্দু কে' রচনা থেকে। এই রচনার মধ্য দিয়ে সাভারকর হিন্দুত্বকে একটি সুসংহত ও শক্তিশালী মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

সাভারকরই হলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। ১৯২৩-এ তিনি তাঁর 'হিন্দুত্ব' পুস্তকে এটি প্রথম উল্লেখ করেন। তারপর ১৯৩৭-এর ৩০ ডিসেম্বর হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে বলেন, প্রধানত দুটি জাতি ভারতবর্ষে, হিন্দু এবং মুসলিম। এক বছর পর ১৯৩৮-এ তিনি বলেন, ভারতবর্ষে— আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুরাই হল প্রধান জাতি আর মুসলিম সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ধর্ম বর্ণ প্রদেশ নির্বিশেষে সমস্বার্থের ভিত্তিতে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠছিল তার পাল্টা 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের' তত্ত্ব নিয়ে আসে আরএসএস। হেডগেওয়ারের পরবর্তী সরসংঘচালক গোলওয়ালকর এ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রাচীন জাতিগুলির অভিজ্ঞতা-অনুমোদিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হিন্দুস্থানের সমস্ত অহিন্দু মানুষ হয় হিন্দু ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে, হিন্দু জাতির গৌরব-গাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না। অর্থাৎ তারা শুধু তাদের অসহিষ্ণুতার মনোভাব এবং এই সুপ্রাচীন দেশ ও তার ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবই ত্যাগ করবে না, এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির মনোভাব তৈরি করবে। এক কথায় তারা হয় আর বিদেশি হয়ে থাকবে না, না হলে সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু জাতির এই দেশে তারা থাকবে অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি ছাড়া, কোনও সুবিধা ছাড়া এবং কোনও রকমের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার ছাড়া। এমনকি নাগরিক অধিকারও থাকবে না।" (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড)।

ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের তত্ত্বকে নস্যাৎ করার জন্য গোলওয়ালকর ওই নিবন্ধে লিখলেন, "যে অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণ বিপদের তত্ত্বে আজ আমাদের রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছে, তাতে আমাদের প্রকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদের যথার্থ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়বস্তু থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর স্বাধীনতা আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হচ্ছে। দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধিতা সমার্থক হয়ে পড়ছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এর নেতৃত্ব, সাধারণ মানুষ— প্রত্যেকের ওপর এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ছে (পৃঃ ১৪২)।

এক দিকে হিন্দুত্বের নামে আরএসএসের এই ধর্মীয় আধিপত্যবাদী মনোভাব পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। অন্য দিকে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা তার অনুগামীদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িক চিন্তার ভ্রান্ত ভাবনায় প্রভাবিত করে তোলে।

(চলবে)

খনিজ সম্পদ ধনকুবেরদের দেওয়ার পরিকল্পনা

চারের পাতার পর

অঙ্গনওয়াড়ি ও পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি হয়। যখন কোনও কোম্পানিকে আইনত প্রাপ্য শুল্ক মকুব করা হয়, তখন রাজকোষের যে ক্ষতি হয় তাতে সাধারণ মানুষ নতুন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা সেচ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হন।

সেই কারণেই এই নতুন আইনে উল্লিখিত মকুবের বিষয় কোনও কর্পোরেট করের প্রযুক্তিগত প্রশ্ন নয় বা ব্যবসার নীতি সংক্রান্ত কোনও বিতর্ক নয়। এ ক্ষেত্রে জনগণের টাকা বেসরকারি মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৯ডি(২) ধারায় বাতিল হওয়া প্রতিটি বকেয়া টাকা খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খনি কোম্পানিগুলির ব্যালেন্স শিটে রেখে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ জনগণের টাকা গিয়ে ঢুকছে মালিক শ্রেণির পকেটে।

একে 'সংস্কার' বলার অর্থ হল কর্পোরেট বোর্ডের ভাষা ব্যবহার করে গরিব মানুষের সম্পদ ধনীদের দিয়ে দেওয়া। পরিষ্কার এ একটা জনবিরোধী নীতি এবং এই নীতির সৃষ্টি হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু খনি কর্পোরেশনের (যার মধ্যে অনেক বহুজাতিক সংস্থাও রয়েছে) মুনাফাকে স্ফীত করার জন্য। এবং তা করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে।

জমি রাজ্যের বিষয়

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, জমি রাজ্যের বিষয় এবং রাজ্য সরকার জমির ওপর কর বসাতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, রাজ্যের এই অধিকার খর্ব করা যায় না। রাজ্য সরকারের এই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার একতিয়ার সংসদের নেই। সেই কারণে রাজ্য সরকারের কর আরোপের ক্ষমতা সংকুচিত করার কোনও নীতিনির্দেশক মানদণ্ড নতুন আইনে নেই। পুরো বিষয়টাই রুলসের মাধ্যমে নির্ধারণ করার জন্য কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যার সহজ অর্থ, কেন্দ্রীয় সরকারের শুভ ইচ্ছার উপর সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। প্রশাসনিক আদেশ বলেই কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা মতো রাজ্য সরকারের মতামতের কোনও তোয়াক্কা না করে জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় স্বার্থের কথা বলছে। প্রশ্ন হল, এই তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ কাদের স্বার্থ রক্ষা করবে?

কাদের জন্য আইন

নতুন আইন তৈরির 'উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কিত সরকারের বিবৃতি' পড়ে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে, এই আইন কাদের জন্য রচিত। এই বিবৃতিতে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার কোম্পানিগুলোর উপর 'ভারী করের বোঝা' চাপিয়েছে, তারা খনি খাতকে 'বাণিজ্যিক ভাবে অলাভজনক' করে তোলার মতো শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে। এতে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই, 'বিকশিত ভারত-২০৪৭-এর ভিশন'-কে সামনে রেখে এর অবসান প্রয়োজন।

প্রতিশ্রুতিতে ভরা কথাগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যাবে, মূল যুক্তি খুবই সাধারণ— রাজ্যগুলো খনি কোম্পানির কাছ থেকে অতিরিক্ত চার্জ নিচ্ছিল এবং এতে তাদের মুনাফা কমে যাচ্ছিল। তাই রাজ্যগুলোকে থামাতে হবে।

এখানে 'বোঝা' শব্দটি কী ভাবে নিঃশব্দে ব্যবহার করা হয়েছে তা লক্ষ করুন। খনিজের উপর রাজ্য সরকারের শুল্ককে শিল্পের ওপর 'বোঝা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মাটির নিচ থেকে সম্পদ নিয়ে যাওয়ার বিনিময়ে এই শুল্ক যে রাজ্যের প্রাপ্য— বিষয়টিকে এই ভাবে দেখা হয়নি।

কোনটা সমস্যা? যে সম্পদ আর কখনও ফিরে আসবে না, সেই সম্পদ লুট করা সমস্যা নয়! বিষাক্ত নদী, কেটে ফেলা বন বা প্ল্যান্ট তৈরির জন্য জলে ডুবে যাওয়া গ্রামের সমস্যার কথা বলা হয়নি। খনি পরিচালনার 'অর্থনৈতিক মূল্য ও লাভজনকতা' কমে যাওয়াটাই ওদের ভাষায় মূল সমস্যা! কার লাভজনকতা? কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর লাভজনকতা। সংসদে সরকার তা গোপন করার চেষ্টা করেনি।

সংসদের উভয় কক্ষে বিলটি পাশ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে। বলেছে, এটা কেবল প্রধান খনিজগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং রাজ্যগুলো এখনও খনি রাজস্বের প্রায় ৯০ শতাংশ পাবে। বাস্তবে বিষয়টা একেবারেই তা নয়। রাজ্যগুলোকে কতটা অংশ দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন, নতুন আইনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যে রাজ্যের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে। দেশের যে সব রাজ্যে খনিজ সম্পদ রয়েছে, সেখানকার মানুষই পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি, উচ্ছেদ, বন ধ্বংস এবং জল দূষণের শিকার হয়। তাদের বলা হচ্ছে, স্বাধীনভাবে নিজস্ব জমির জন্য তারা আর শুল্ক নির্ধারণ করতে পারবে না। যে রাজ্যকে নিজের জমির উপর কর বসাতে দিল্লির অনুমতি নিতে হয়, সে কি কখনও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রে সমান অংশীদার থাকে? থাকে না। সে কেন্দ্রের শর্তে কাজ করা এক ঠিকাদারে পরিণত হয়।

এ কোনও একটা দল বা কোনও একটা অঞ্চলের অভিযোগ নয়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী একে একটা 'কালা আইন' বলে অভিহিত করেছেন এবং আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০২৪-২৫ সালে ঝাড়খণ্ডের নিজস্ব অ-কর রাজস্বের ৮৪.৯ শতাংশই এসেছিল খনি রাজস্ব থেকে। এই রাজস্ব কেড়ে নিলে রাজ্যের পুরো জনকল্যাণমূলক কাঠামো ভেঙে পড়বে। কেরালা বলেছে, এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির লঙ্ঘন এবং তারা আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলোও এই আইন পর্যালোচনা করছে।

যদিও ভুলে গেলে চলবে না যে, সব সরকার নিজেরাই আদিবাসীদের জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিযোগিতা করছে, তারা জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য গ্যারান্টি হতে পারে না। একমাত্র প্রকৃত গ্যারান্টি হল— কৃষক, আদিবাসী ও শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত শক্তি।

যে বিষয়ে আইন নীরব

এই নতুন আইন বে-আইনি খনি ব্যবসা সম্পর্কে কিছুই বলেনি। অথচ, এই বে-আইনি খনি ব্যবসা প্রতি বছর দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার খনিজ সম্পদ লুটে নেয়। একের পর এক কমিশনের রিপোর্টে এই সব ঘটনা নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কোন জমি খনিজ সমৃদ্ধ এবং তার উপর কী চার্জ নেওয়া যেতে পারে তা ঠিক করার ক্ষমতা কেন্দ্র নিজের হাতে নিয়েছে, কিন্তু রাজ্যে তা প্রয়োগ করার পুরো দায়ভার সেই রাজ্যগুলোর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের টাকা কেড়ে নিয়ে তারপর তাকে খনি মাফিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হচ্ছে। সবাই জানেন এ অবাস্তব এবং খনি মাফিয়া নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য নয়।

এই জমিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের সম্মতি প্রসঙ্গে কোনও কথা নেই, গ্রামসভা সম্পর্কে কিছু নেই, বন অধিকার আইন (Forest Rights Act) সম্পর্কে কিছু নেই, বা বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন সম্পর্কেও কোনও কথা বলা হয়নি। এই দেশের খনিজ অঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও কৃষকের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে একটি শব্দও এই আইনে খরচ করা হয়নি।

বিশ্বের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, খনিজ পদার্থ উত্তোলনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, পরিবেশের উপর তার প্রভাবকে খেয়ালে রাখতে হবে। কিন্তু এই নতুন আইনে এই প্রসঙ্গে একটা কথাও বলা হয়নি। যেন ভারতে খনি খাতের একমাত্র সমস্যা হল— কোম্পানিগুলো যথেষ্ট দ্রুত গতিতে মুনাফা করতে পারছে না! সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক এঙ্গেলস বহু দিন আগে যা লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা আমাদের মনে রাখা উচিত— 'প্রকৃতির উপর মানব বিজয়ের জন্য আমরা যেন নিজেদের অতিরিক্ত প্রশংসা না করি। কারণ প্রতিটি বিজয়ের জন্য প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়।' এই আইন বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর খনিজ উত্তোলনকে দ্রুত ও লাভজনক করার জন্য তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে এমন একটা সময়ে যখন জলবায়ু সংকট দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করছে। তাই এই আইন জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে এ কথা বলা চলে না। এই আইন জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মালিকদের পকেট ভরানোর আইন।

আইন আরও যে বিষয়টা লুকোচ্ছে তা হল— খনিজ কোনও ফসল নয়। মাটি থেকে তোলা প্রতি টন আকরিক এমন এক সম্পদ যা মানুষ পুনরুৎপাদন করতে পারে না। এর মূল্য চোকানো হয় জমি, জল, বন এবং তার উপরে থাকা মানুষের জীবনের বিনিময়ে। এই ধরনের সম্পদকে সচেতন ভাবে, পরিমিত ভাবে এবং একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হয়। আর সেই উদ্দেশ্য হতে পারে কেবল দেশের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ। খনি খননের যৌক্তিকতা কেবল তখনই থাকে যখন তা যে মাটি থেকে নেওয়া হয়েছে সেখানকার মানুষকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া হয়, অন্য কিছুতেই তার ক্ষতিপূরণ হয় না।

এখানে বা দুনিয়ার অধিকাংশ খনিজ সমৃদ্ধ দেশে তা ঘটছে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কী প্রয়োজন তার তোয়াক্কা না করে অসংযতভাবে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা হচ্ছে এবং বিদেশের বাজারে তা চালান করা হচ্ছে। অন্য দিকে যাঁরা সেই জমিতে বাস করেন তাঁদের জন্য পড়ে থাকছে গর্ত, ধুলো আর শুকনো কুয়ো। আকরিক চলে যায়। মুনাফা চলে যায়। থেকে যায় কেবল ক্ষয়ক্ষতি। মানুষের উন্নয়নের জন্য সীমিত সম্পদের সতর্ক ব্যবহার আর কর্পোরেট মুনাফা ও রপ্তানি অর্ডারের জন্য পৃথিবীর বুক নির্দয় ভাবে চিরে ফেলা— এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

এই দেশের খনিজ অঞ্চল কোনও ফাঁকা জমি নয়। এ ভারতের আদিবাসী, দলিত ও সবচেয়ে দরিদ্র কৃষকদের বাসস্থান। এই বাসস্থান পূর্বাঞ্চলের ও মধ্যাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিস্তৃত। সেই অঞ্চলে মাটির নিচে আকরিক ও কয়লা পড়ে আছে।

আজ আমরা দেশের নানা এলাকায় দেখতে পাচ্ছি উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের নামে ইস্পাত কারখানা এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য উর্বর গ্রাম ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। সেখানে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেই চাকরি কখনও পাওয়া যায় না অথবা নির্মাণ পর্ব শেষ হলেই তা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এই আইনেও একই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে— কিন্তু তারও অবস্থা যে একই রকম হবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তাই সাধারণ মানুষের কাছে এই আইনের দুটো বাস্তব অর্থ দাঁড়ায়। প্রথমত, যে টাকা তাদের জেলায় একটি স্কুল, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা একটি চেক ড্যামের জন্য দেওয়া যেত, তা এখন খনি কোম্পানিগুলোর অ্যাকাউন্টে থেকে যাবে। এই ধরনের অনেকগুলি জেলায় অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য রাজস্বই নেই। আদিবাসী সম্প্রদায়, মহিলা ও শিশুদের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো এই খনিজ শুল্কের ওপর ভিত্তি করেই চলে। শুল্ক চলে গেলে প্রকল্পগুলোও তার সাথে চলে যাবে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র নিজের তৈরি মানদণ্ডের ভিত্তিতে 'যে কোনও জমি'-কে খনিজ সমৃদ্ধ জমি হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে খনি আছে, জমি তার সাথেই চলে যাবে। উপরের মাটি ছেঁটে ফেলা হবে এবং যে জমি বংশপরম্পরায় একটি পরিবারকে অন্ন জোগাত তা শেষ হয়ে যাবে। খনি শুকনো রাখার জন্য ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে কুয়োগুলো বছরের পর বছর শুকিয়ে থাকে, আর অবশিষ্ট জল পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। গবাদি পশুর চরে বেড়ানোর জায়গা থাকে না এবং যতটুকু ফসল টিকে থাকে তা ধুলোয় ঢেকে যায়। যে বন আদিবাসী পরিবারকে জ্বালানি কাঠ, মহুয়া, কেন্দু পাতা ও ওষুধ জোগাত তা কেটে ফেলা হয় এবং জঙ্গলে যে সব প্রাণী বাস করত তাদের তাড়িয়ে দেওয়া বা মেরে ফেলা হয়। অন্য কারও ঠিক করা ক্ষতিপূরণের টাকাকে ভিত্তি করে পুরো পাড়াকে কোনও পুনর্বাসন কলোনিতে সরিয়ে নেওয়া হয়, আর শত শত বছর ধরে যারা নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এমন এক-একটি জনগোষ্ঠী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারা এই স্থানান্তরণের ধাক্কা সামলাতে পারে না। খনি অঞ্চলে যা পড়ে থাকে তা উন্নয়ন নয়, বরং একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট যা আকরিক শেষ হওয়ার পরও বহুকাল ধরে বজায় থাকে। সরকারের 'অর্থনৈতিক মূল্য ও লাভজনকতা'-র হিসাবের মধ্যে এর কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। কোম্পানি হিসাব করে সে কত মুনাফা পেল। সে হিসাব করে না, পেছনে সে কী ফেলে গেল।

ওরা এই সব কিছুকে 'জাতীয় স্বার্থ' বলে দাবি করে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, কার দেশ, কার স্বার্থ? ভারতের মাটির নিচের সম্পদ সেই মাটির মানুষের, যাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে সেখানে বাস করছেন, যাঁরা এর ওপর তাদের জীবন ও সমাজ গড়ে তুলেছেন। ২০২৬ সালের ১৫৪ নম্বর বিল এবং লোকসভার কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠতাই এই সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে না। তাই এই কালা আইনের বিরোধিতা করতেই হবে আদালতে, বিধানসভায় এবং সর্বোপরি গ্রাম ও ময়দানে, যেখানে এর প্রভাব সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে পড়বে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 79, No.: 10 Bengali Weekly 2 October, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ও জনগণের শিক্ষানীতি চালুর দাবিতে কলকাতা জেলা শিক্ষা কনভেনশন

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে ২৭ সেপ্টেম্বর মধ্য কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারত সভা হলে কলকাতা জেলা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি বাগচীকে সভাপতি করে ৬০ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়। নতুন জেলা কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস বক্তব্য পেশ করেন।

সম্মেলনে যোগ দেন শতাধিক প্রতিনিধি। সভায় একটি অ্যাপ্রোচ পেপার পেশ করা হয়। অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চপ্রাথমিক, সেকেন্ডারি থেকে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার নানা সমস্যা, শিক্ষকের অপ্রতুলতা ও পরিকাঠামোর বেহাল অবস্থা নিয়ে বক্তারা সোচ্চার হন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মাধ্যমে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারি পরিকল্পনায় যেভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার সামগ্রিক উদ্যোগের পরিকল্পনা চলছে। তাকে আটকাতে ও প্রতিরোধের উপায় সন্ধানে বিভিন্ন বক্তারা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন। প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে শিক্ষিকা শম্পা সরকারকে সম্পাদক এবং শিক্ষক সুব্রত প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক মানুষ। সভায় বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক শান্তনু রায়, অধ্যাপক মনোজ গুহ, অধ্যাপক গৌতম মাইতি, সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। অধ্যাপক নস্কর বলেন, 'আমরা সমস্ত রাজ্যে জনবিরোধী শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল করে জনগণের শিক্ষানীতি ২০২৬ চালু করার দাবি জানিয়েছি। সে জন্য এ বছরের ২৪ জানুয়ারি বাঙ্গালোরে গৃহীত শিক্ষানীতি বই হিসেবে প্রকাশ করে সরকারি কর্তাদের কাছে পাঠিয়েছি। তাঁরা এটাকে চালু করতে চাইবেন না, কিন্তু জনগণের মতামত তাঁদের মানতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে আন্দোলন জোরদার করে আমরা দেশব্যাপী চাপ সৃষ্টি করব।' (ছবি)

সেবা সংকল্প অভিযানের নামে নির্লজ্জ আত্মপ্রচার

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর গত ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

নরেন্দ্র মোদির শাসন কালের ২৫ বর্ষপূর্তি উদযাপনের জন্য একের পর যে অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হচ্ছে তা নজিরবিহীন। দেশজুড়ে এক মাস ব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান'-র পর, মোদিজির জন্মদিন উপলক্ষে প্রথমে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, এখন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'নমো সেবা' নাটকের অভিনয়ের নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে। এই নাটক করতে হবে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন ২৬ সেপ্টেম্বর। আত্মপ্রচারের এত নির্লজ্জ ব্যবস্থা অতীতে কোনও প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে হয়নি। এই প্রচারাভিযানের মধ্য দিয়ে সরকারের ধসে পড়া ভাবমূর্তি কি পুনরুদ্ধার হবে?

এসব না করে কেন্দ্রীয় সরকার যদি সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো উন্নয়ন করে, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করে, গবেষকদের জন্য স্কলারশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ভর্তি সমেত নানা পরীক্ষা পরিচালনাকে দুর্নীতিমুক্ত করে ভেঙে পড়া সরকার পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করত তাহলে তাঁর ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হত। এই সস্তার হাস্যাস্পদ কর্মসূচি পালন না করে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি করছি।

চেতলায় বাস পরিষেবার দাবি

দক্ষিণ চেতলা এলাকা থেকে নিউ আলিপুর, বেহালা, রাসবিহারী, হাজরায় যাতায়াতের জন্য একসময় কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বাস চলত। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে সেই বাস পরিষেবা বন্ধআছে। পুনরায় চেতলা রোড সহ ওই এলাকা দিয়ে বাস চালুর দাবিতে সোচ্চার হয়েছে চেতলার নাগরিকরা। পরিবহণ মন্ত্রীর উদ্দেশ্য দাবিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এলাকার বহু নাগরিক।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ ও শাস্তির দাবি

ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির

পশ্চিমবঙ্গের ভোটাধিকার বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের সংগঠন ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও শিশির সরকার ২৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

অবিলম্বে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, বেআইনি, অসাংবিধানিক ও স্বৈরাচারী পদক্ষেপ করে কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকারের পরিকল্পনামাফিক নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করে সারা দেশের ১৩ কোটি ভারতবাসীর নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য নিকৃষ্টতম অপরাধ।

গণতন্ত্রের একটি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মান ধূলিসাৎ করে বাস্তবে নির্বাচনকেই পরিহাসে পরিণত করেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারদের বাইরে রেখে পশ্চিমবাংলা সহ যে সব রাজ্যের নির্বাচন হয়েছে এ সব ক্ষেত্রে প্রকৃত ভোটারদের তালিকায় ফিরিয়ে এনে পুনর্নির্বাচনের দাবি ন্যায্য এবং আমরা সমিতির পক্ষ থেকে তা সমর্থন করি। পশ্চিমবঙ্গের ১৬ লক্ষের অধিক পুনরায় তালিকাভুক্ত ভোটারের নাম বাদ দেবার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব আপিল, ২২ লক্ষাধিক নাগরিকের আপিলের নিষ্পত্তি না করে পুনরায় পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি, অযোগ্যদের তালিকাভুক্ত করা, কমিশনের আইটি বিভাগ কেন্দ্রীয় ভাবে কুক্ষিগত করে রাজ্যের আধিকারিকদের তার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত রাখা প্রভৃতি গর্হিত অপরাধ যা বাকি দুজন নির্বাচন কমিশনারদের আপত্তি সত্ত্বেও জ্ঞানেশ কুমার করেছেন।

ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি পশ্চিমবঙ্গ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে অবিলম্বে রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং ভোট বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষ ও তাদের পরিবারকে এই আন্দোলনে সামিল করবে।

এআইএমএসএস রাজ্য সম্মেলন

একের পাতার পর

প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার, এআইএমএসএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড কল্পনা দত্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্ত্বনা দত্ত। শুরুতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অসিত কুমার চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। এসআইআর বিরোধী নিন্দা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন স্কিম ওয়ার্কার্স আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ইসমত আরা খাতুন, নার্সিং আন্দোলনের নেত্রী ভাস্বতী মুখার্জী। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন সংগঠনের মহিলা প্রতিনিধিরা এবং জেলা সম্পাদক নমিতা বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তারা বর্তমান সময়ে নারী ও শিশুদের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা সংকট নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ২৭ সেপ্টেম্বর শহরের রবীন্দ্র ভবনে ৭৩৮ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশন হয়। সকালে শহিদ বেদিতে মাল্যার্পণ ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশনে খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন রীতা প্রধান। প্রস্তাবের সমর্থনে প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি। তিনি নারীদের ওপর বাড়তে থাকা অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন ও বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন।

সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড ভাস্বতী মুখার্জীকে সভাপতি ও কমরেড রীতা প্রধানকে সম্পাদক করে ৮৯ সদস্যের নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ জানান, কোচবিহারের এই ঐতিহাসিক সম্মেলন বাংলার নারীদের অধিকার রক্ষা এবং সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে এক নতুন মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রতিনিধি সম্মেলনের একাংশ

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com